বিড়াল তপস্বী

ফরিদ আহমেদ

বাংলাদেশের ছদ্মবেশী সামরিক শাসকেরা হঠাৎ করেই তাদের ছদ্মবেশ খুলে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন পুসি ক্যাট সেজে থাকা বিড়াল তপস্বী বঙ্গ শার্দুল এখন আড়মোড়া ভেঙ্গে শিকারের খোঁজে বের হয়েছে। রক্তের লোভ আর কতদিন সামাল দেওয়া যায়। তাইতো শুরু হয়েছে পেশির আস্ফালন, তর্জন গর্জন আর হুংকার।

ক্ষমতায় অন্ধ জাতীয়তাবাদী ও জামাতের চরম দূর্নীতিবাজ লোকগুলো মহাচোর তারেকের নেতৃত্বে আবারো ক্ষমতার ক্ষীর-পায়েস খাওয়ার লোভে যেনতেনভাবে লোক দেখানো একটা কারচুপির নির্বাচন আয়োজন করতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যেই ইয়াজউদ্দিন নামের এক ইয়েসউদ্দিনকে সামনে রেখে একপাল ক্যুৎসিত নোংরা ভাড়কে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল জনগণের সাথে কঠিন রঙ্গ তামাশায়। সেইসব কুৎসিত ভাড়দের ততোধিক কুৎসিত স্থূল রঙ্গ-তামাশায় লোকজন যখন চরমভাবে বিপর্যস্ত ও ভয়াবহভাবে ত্যক্ত-বিরক্ত , তখনি হঠাৎ করে একরাতে আসমান ফুড়ে হাজির হয় এই সব বিড়াল তপস্বীরা। রাজরানী খালেদা আর তার গুনধর সুপুত্র যুবরাজ তারেকের ভয়াবহ অত্যাচারে অতিষ্ট দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এইসব তথাকথিত ফেরেশতাদের আগমনে। ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়েছিল তাদেরকে। বেশিরভাগ লোকই তখন বুঝতে পারেনি এইসব ফেরেশতাদের আসল উদ্দেশ্য। মুনতাসীর মামুনদের মতো অল্প কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান লোক অবশ্য ঠিকই বুঝেছিলেন, কিন্তু গগনবিদারী স্বাগত শ্লোগানে লিপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের কানে পৌছতে পারেনি তাদের সেই ক্ষীনকণ্ঠের সাবধান বানী ।

অবশ্য বাঙ্গালীকে এ ব্যাপারে দোষ দিয়েও লাভ নেই। আমরা বাঙ্গালীরা সমসময়ই সমৃতিভ্রংশ রোগে ভুগি। খুব বেশিদিন আগের কথা আমরা খুব একটা মনে রাখতে পারিনা। রাখতে চাইও না। কি দরকার বাবা অপ্রয়োজনীয় সমৃতির ভার বহন করে। জীবনের ভার বহন করতে করতেই যখন ক্লান্ত আমরা। তাইতো স্বাধীনতার মাত্র কয়েকবছরের মধ্যেই আমরা দিব্যি ভুলে যাই কে ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক। রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে ধরে নিয়ে এসে চালিয়ে দেই স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে। স্বাধীনতার দিনক্ষনও পালটে দেই ইচ্ছেমত ঘন ঘন। স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তিও পালটে যায় অনায়াসে। মনে হয় বুঝি নিজামী-মুজাহিদ, গোলাম আজমরাই, প্রবল দেশপ্রেম নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আর সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশী জাতির জনক শহীদ জিয়া। বন্ধুপ্রতীম পাকিস্তান তাদের বিপুল ভালবাসা দিয়ে আমাদের সেই মুক্তির সংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। শেখ মুজিব-তাজউদ্দীনরা ছিল মহান সেই যুদ্ধের খলনায়ক, দেশদ্রোহী-বিশ্বাসঘাতক। যাদেরকে এখন মুক্তিযোদ্ধা বলা হয় তারাই আসলে ছিল রাজাকার আলবদর। প্রবল দেশপ্রেমে সীমাহীন ঘৃনায় আমরা মুন্ডুপাত করি তাদের। এমনই বিসমৃতিপরায়ন জাতি আমরা। কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ একবার তার এক

লেখায় বাঙ্গালীর সমৃতি শক্তিকে গোলড ফিশের ক্ষণস্থায়ী সমৃতির সাথে তুলনা করেছিলেন। গোলড ফিশ যেমন একুরিয়ামের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে যেতেই তার সব সমৃতি ভুলে যায় আমরাও তেমনি সামান্য কিছুদিন পরেই অবলীলায় ভুলে যাই আগের সব ঘটনা ।

তা না হলে সামরিক শাসনের অসংখ্য দ্দাদগে ক্ষত থাকা সত্ত্বেও আমরা এমন উচ্ছ্বাস দেখাতাম না ফখরুদ্দিনের এই ছদ্মবেশি সামরিক সরকারের প্রতি। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই দেশ ও জাতির 'ক্রান্তিলগ্নে' মধ্যরাতে উর্দিপরা ফেরেশতাদের নাজিল ঘটছে বিরামহীনভাবে। নিরেট মস্তিষ্ক এই সব লেফট রাইট করা জঙ্গী শাসকদের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কবে কোন আমলে কোন অজানা দেশে তাদের কোন প্র-পিতামহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের এক অব্যর্থ ফর্মুলা আবিষ্কার করে গিয়েছিল, সেই গতানুগতিক একই ফর্মুলা ধরে তার বংশধরেরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দিনের পর দিন রাজত্ব করে যাচ্ছে বেশ দাপটের সাথেই। অবশ্য বন্দুকের নলের এমনই শক্তি যে সেখানে উদ্ভাবনী কোন ক্ষমতার প্রয়োজন পড়ে না। বন্দুক দেখলে চরম ত্যাদড় বান্দাও একেবারে বাঁশের মত সোজা হয়ে যায়। কোনরকম ট্যা ফো করার আর সাহস পায় না।

অবশ্য ডঃ ফখরুদ্দিনের সরকার (জেনারেল মঈনের সরকার বলাটাই বোধ হয় বেশি যুক্তিসঙ্গত) আগের তুলনায় সামান্য কিছু ব্যতিক্রম। এর আগে দেখা যেতো যে, দেশদরদি সামরিক বাহিনীর সহযোগিতার জন্য বিজ্ঞ বিচারপতিরা এসো আমার ঘরে এসো গান গাইতে গাইতে হা করে দরজা খুলে বসে থাকতেন। দুর্ভাগ্য, এবারে তাদের ভাগ্যে আর শিকে জোটেনি। গত কিছুদিন ধরে বিচারকরা তাদের ভাবমুর্তি ও সম্মানের ষোলকলা এমনভাবেই পূর্ণ করেছেন যে নব্য ফেরেশতারা আর তাদের উপর ভরসা রাখতে পারেননি কোনভাবেই। জনগণের কাছে বিচারপতিদের মান-মর্যাদা এমনই অবস্থায় পৌছেছে যে আদালত অবমাননার ভয় দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে এখন জোর করে সম্মান নিতে হয় তাদের । কাজেই প্রাথমিকভাবে ফেরেশতারা তাদের উর্দি ঢাকতে এবার বেছে নিয়েছেন চিনে জোঁকের মতো অবিরাম দেশের রক্ত চুষে খাওয়া সভ্যভব্য চেহারার সুশীল সমাজের এক অংশকে। নয়া এই কৌশলের কারণে উর্দিধারীদের আবিষ্কার করতে দেশবাসীর একটু বেগই পেতে হয়েছে এবার।

দেশের ক্রান্তিকালে অহি নিয়ে নাজিল হওয়া ফেরেশতাদের প্রথম কাজ হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করা। চুনোপুটি থেকে শুরু করে কিছু রাঘব বোয়ালকে ধরে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হয় শ্রীঘরে। যাদের অত্যাচারে একসময় অতিষ্ট থাকতো তাদের এরকম দুরাবস্থা দেখে লোকজন মহা খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করে। ভাবে এতদিনে সত্যি বুঝি প্রকৃত দেশদরদি, সৎ এবং মহান নেতার আগমন ঘটেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে উর্দি পরা লোকজন নায্যমূল্যে চাল ডাল তেল নুন বেচতে থাকে সাধারণ লোকজনের মধ্যে। এর মধ্যে প্রধান ফেরেশতা আবার গাড়ী বাদ দিয়ে পায়ে হেটে বা সাইকেল চালিয়ে অফিসে যাওয়া আসা শুরু করেন। সেই দৃশ্য বেশ ঘটা করে দেখানো হয় টেলিভিশনে । জনগণকে বার বার আশ্বস্ত করা হয় এই বলে যে, দেশপ্রেমিক বাহিনীর ক্ষমতা পাকাপাকিভাবে দখলের কোন ইচ্ছাই নেই। সব আবর্জনা পরিষ্কার হলেই তারা আবার ফিরে যাবে ব্যারাকে । এমন সুখের দিন জনগণ কবে দেখেছে। দেশপ্রেমিক বাহিনী কত পরিশ্রম করে রাজনৈতিকদের রেখে যাওয়া আবর্জনা সরাচ্ছে।

তবে এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু অন্য ধরনের ঘটনাও ঘটায় উর্দিধারীরা। কোন প্রেমিক-প্রেমিকা হয়তো বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে বিকালে রিকশায় করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকার এই ভালবাসা উর্দিধারীদের হৃদয়ে চরম ক্রোধের সৃষ্টি করে। প্রেমিকার সামনেই প্রেমিককে কান ধরে উঠ-বস করায় তারা। দু'চারটে চড় থাপ্পড়ও বসিয়ে দিতে দ্বিধা করে না তারা। কোন নবীন যুবক হয়তো শখ করে চুল বড় রেখে মোটর সাইকেলে করে ঘুরতে বেরিয়েছে। উর্দিধারিদের এগুলো একেবারেই না পছন্দ। তারা নিজেরাই কেচি জোগাড় করে এনে ছেটে দেয় সেই তরুনের শখের বাহারি চুল। শাড়ী পরা মহিলাদের যাতে পেট দেখা না যায় সে জন্য কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে প্রেস নোট আসে সরকারের তরফ থেকে। ফেরেশতাদের এই সমস্ত ছোট খাটো উপদ্রব অবশ্য জনগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। উর্দিধারীদের এরকম একটু আধটু গরম মেজাজ থাকবে এটাইতো স্বাভাবিক। সাধে কি আর বলে মিলিটারি মেজাজ !!

এই মধুচন্দ্রিমা শেষ হতে অবশ্য খুব বেশিদিন লাগে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যাদেরকে চরম দুর্নীতির দায়ে হাতকড়া পরে জেলে ঢুকতে দেখেছে তাদেরকেই ফুলের মালা গলায় দিয়ে জেল হতে বের হতে দেখে জনগণ। ফেরেশতাদের তৈরি করা সৎ মানুষের পার্টিতে দলে দলে যোগ দেয় তারা। হাসিমুখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেয়। যারা ফালু, হুদা, মওদুদ, মির্জা আব্বাসদের জেলে যাওয়া দেখে এখন মহানন্দে শিঙ্গা ফুকাচ্ছেন, তারা এন্টি-ক্লাইমাক্সের জন্য তৈরি থাকলেই ভাল করবেন। খুব শিঘ্রিই হয়তো আবারো নতুন মন্ত্রী সভায় আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে আরো দাপটের সাথে উপস্থিত হবেন এইসব গুনধরেরা।

আমাদের আগের প্রজন্ম আইউব, ইয়াহিয়া নামের ফেরেশতাদের দেখেছেন। দিনের পর দিন রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। আমরা আমাদের কৈশোর ও তারুন্যে দেখেছি এরশাদ নামের আরেক ফেরেশতার রক্তের হোলি খেলা। সেলিম, দেলোয়ার, রাউফুন বসুনিয়া, দীপালী সাহা, তাজুল, নূর হোসেন, ডাঃ মিলনদের রক্তের নদী বয়ে যেতে দেখেছি রাজপথে। আরো এক রক্তের সমুদ্রের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বসেছে নতুন একদল ফেরেশতা। আগামি দিনে অসংখ্য কিশোর তরুনকে তাদের শরীরের তাজা রক্ত দিয়ে সেই সমুদ্রের গভীরতা বাড়াতে হবে এটা নিশ্চিত করেই বলে দেওয়া যায়।

বিশ্ববেহায়া এরশাদের কঠিন থাবা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের রক্তঝরানো লড়াই করতে হয়েছিল নয় নয়টা বছর। ছদ্মবেশী এই ফেরেশতাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে এই প্রজন্মের তরুনদের কতদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হবে কে জানে।

মায়ামি, ফ্লোরিডা
farid300@gmail.com